পৌরাণিকী

[বেহুলা, জড়ভরত, সতী, ফুল্লরা, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ]

দীনেশচন্দ্র সেন

পত্রপুট

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৪

প্রকাশক
পত্রপুট
৩৭, আর এম দাস রোড,
সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক
শোভা প্রকাশ

স্বত্ব
প্রকাশক

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
এমএ আরিফ

মুদ্রণ
একতা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

দাম
৪০০ টাকা

ISBN : 978-984-94763-5-1

Pouranki by Rai Bahadur D. Dinesh Chandra Sen; Published by: Patroput, 38/4 Banglabazar, Mannan Market, Dhaka-1100. Price : 400.00 Taka.

ঘরে বসে বই কিনতে ভিজিট করুন
http:// rokomari.com
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭

তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে”
কালিদাসের এই উক্তি স্মরণ করিয়া– তরুণ বয়সে সর্ব্ববিষয়ে প্রবীণতা প্রাপ্তবর্ত্তমান বঙ্গীয় উচ্চ শিক্ষার কাণ্ডারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর-কমলে ‘পৌরাণিকী উৎসর্গ করিলাম।

৬ই আগষ্ট শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
বেহালা
১১৩৪

বর্ত্তমান সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-এর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি-উৎসব সমাগত প্রায়। ইতিমধ্যে পৌরাণিকী বর্ত্তমান সংস্করণ অনুরাগী পাঠকবৃন্দের আন্তরিক উৎসাহে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সন্নিবেশিত বেহুলা, জড়ভরত, ফুল্লরা, সতী, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ প্রভৃতি গ্রন্থও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণের প্রকাশন ব্যবস্থায় যাহার উৎসাহ আমাকে সকল দিক হইতে প্রেরণা দিয়াছিল, সেই পিতৃপ্রতিম রামেশ্বর দে-র কথা আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মনসার ভাসান-গান এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, এতদ্দেশের প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান-গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্তী কল্পনা করিয়া দুখাইভব করিত। বর্দ্ধমানের ষোল ক্রোশ পশ্চিমে একটি চম্পকনগর আছে এবং তন্নিকটে বেহুলা নদীও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মীন্দরের বাসর-গৃহের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে ত্রিপুরা জেলাতেও আর-একটি চম্পকনগর আছে। 'আসাম-ভ্রমণ'-প্রণেতা লিখিয়াছেন, ধুবড়ী অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থানেই চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল। বগুড়ার নিকট মহাস্থান বলিয়া একটা স্থান আছে; অনেকে বলেন, চাঁদ-সদাগর তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে রণিৎ নদীর তীরে চাঁদ-সদাগরের নিবাস-ভূমি ছিল বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এদিকে দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্ত-নগরের নিকটবর্ত্তী সনকাগ্রামে চাঁদ-সদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ এখনও বিদ্যমান বলিয়া অনেকের ধারণা। মালদহের চাঁপাইনগর ও নেতাধোপানীর ঘাট, বীরভূমে বিপুলার মেলা, চট্টগ্রামের 'চাঁদ-সদাগরের দীঘি' ও 'কালুকামারের ভিটা'র উল্লেখ আমরা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দীপ্রণীত 'চন্দ্রধর' কাব্যের ভূমিকায় প্রাপ্ত হইয়াছি। শুধু বঙ্গদেশ নহে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও চাঁদ-সদাগর-সংক্রান্ত কাহিনী বহুস্থলে প্রচলিত আছে।

যে ঘটনাকে বঙ্গদেশ ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহের প্রত্যেক বিভাগের লোক আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে এরূপ উৎসুক, তাহার প্রভাব এতদ্দেশের লোকের হৃদয়ে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা কঠিন নহে। বস্তুত, মনসার ভাসান-গান এ দেশের বহু সাধনার সামগ্রী ছিল। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, বহুলোক সেই সময়ে 'দম্ভ করিয়া' বিষহরীর পূজা দিত। বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্ত একখানি মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, কাণা হরিদত্তই মনসার গানের আদিকবি। বিজয়গুপ্ত আরও লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়েই উক্ত আদিকবির গান কালক্রমে লুপ্ত হইয়া

গিয়াছিল। সুতরাং কাণা হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়। কাণা হরিদত্ত তাহা হইলে প্রায় ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে গান রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্প্রতি কাণা হরিদত্তের গানের কতকাংশ মৈমনসিংহ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ 'মনসা-মঙ্গল' বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গীত হইয়া আসিয়াছে। ভাসান-গানে লোকবৃন্দ যে কিরূপ উৎসাহিত হয়, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুমান করা কঠিন ব্যাপার। বরিশাল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রাবণ মাসে নরনারী এই গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া যায়–তাহাদের সেই উন্মত্ত আবেগ দর্শনে স্বতঃই মনে একটা আশ্চর্য্যের ভাব উদয় হয় যে, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এই যে একটা মহা-ভাবের আবর্ত চলিয়া যায়–তাহার একটা লহরী পর্য্যন্ত আসিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে না। স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিবেন কি ভরসায়?

যদি কোন বিষয় অগ্রাহ্যও করিতে হয়, তবে ধীরভাবে তাহার সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখা উচিত। যাহা শত শত বৎসর এ দেশবাসীকে আনন্দ দিয়া অসিয়াছে, সেই উৎসব হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল কেন? পল্লীর মুসলমান কৃষকগণ পর্য্যন্ত মনসার ভাসান- গানের সমস্ত আখ্যায়িকা পরিজ্ঞাত, অথচ আমরা অনেকে তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না; ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান উপাখ্যানে আমি সেই প্রাচীন কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। একটা দ্রব্যের রস স্বয়ং আস্বাদন করা এক কথা এবং অপরকে তুল্যরূপ রস-ভাগ প্রদান করিতে পারা, আর-এক কথা আমি প্রাচীন পুঁথিতে বেহুলার কাহিনী পড়িয়া সেই স্বামি-বিরহ-বিধুরা আশ্চর্য্য-সাধনা-তৎপরা, একান্ত বিপন্না অথচ নির্ভীক হৃদয়া সাধ্বীর উদ্দেশ্যে নির্জ্জনে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাল্মীকির অঙ্কিত সীতা-চরিত্রের ন্যায় বেহুলার চিত্রও আমার ভক্তির অর্ঘ্যদ্বারা মানসপটে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রাচীন কবিগণের সরল উদ্দীপনা ও করুণরস উদ্রেক করিবার অসামান্য শক্তির কণিকাও আমার নাই, সুতরাং আমার তুলিতে নমস্য উপহারূপে পরিণত না হইয়া থাকিলেই যথেষ্ট।

মনসার ভাসানে অনেক কথা আছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সকল বিষয় অবতারিত হয় নাই। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অনেক পদ্মাপুরাণেই আছে। বেহুলার চিত্র চিত্রণে সেই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা

করিলে বর্ণনীয় কাহিনী অযথা ভারাক্রান্ত হইত। এইভাবে শঙ্কর গারুড়ীর মৃত্যু, গুয়াবাড়ী ধ্বংসের বিবরণ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গই ছাড়িয়া দিয়াছি। শঙ্কর গারুড়ীকে প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে 'ধন্বন্তরী' নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত ইহার নিবাস শঙ্কর নগরী নির্দ্দেশ করিয়া বহুস্থানে ইঁহাকে শঙ্কর গারুড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি প্রাচীন কবির অনুসরণ করিয়া, সেই নামই ব্যবহার করিয়াছি। চাঁদের ভৃত্য 'নেড়া'কে কোন কোন কবি 'তেড়া' নামে পরিচিত করিয়াছেন। আমি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। গল্পের মধ্যে আমার নিজের কল্পনা অতি সামান্যই প্রয়োগ করিয়াছি।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, শীতলা প্রভৃতি দেবী সম্বন্ধীয় কাব্য পাঠ করিলে দৃষ্ট হয়, এই সকল কাব্যের মূল ভিত্তি শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব। শৈবধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ-মূলক– জীব এই ধর্মানুসারে পাশমুক্ত হইলেই শিবের সঙ্গে অভেদ হইয়া পড়েন। শিব নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আনন্দময়; কিন্তু শক্তি-বাদীরা দ্বৈতভাব বিশ্বাস করিয়া জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন–সগুণ, সক্রিয় প্রত্যক্ষ দেবতার আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগুলিতে এই প্রভেদ অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শিব-ভক্তগণ স্বীয় উপাস্যের কোন সহায়তাই লাভ করেন নাই। কিন্তু শক্তি–চণ্ডী, মনসা, শীতলা বা অন্য যে আকারেই পূজিত হইয়াছেন- তিনি স্বীয় ভক্তের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টরূপে কল্পিত হইয়াছেন। অনেকটা অমার্জিতভাবে কথিত হইলেও পল্লীকবিগণের কাব্য হইতে এই ভাবটিই উদ্ধার করা যায়। দুঃখের বিষয়, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের বল প্রাচীন কবিগণ ততটা প্রশংসার ভাবে লক্ষ্য করেন নাই, অনেক স্থলেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি বিষয়টি অনুভাবে দেখিয়াছি, কিন্তু মূলগল্পে যেরূপ পাইয়াছি, আখ্যানভাগে তাহার বিশেষ অন্যথাচরণ করি নাই।

দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসান কাব্যে চণ্ডীকে মনসাদেবীর প্রতি-কূলতায় নিযুক্ত করিয়া উপাখ্যান যেভাবে পরিবর্তিত করিয়াছেন, আমি প্রাচীনতর কবিগণের অনুসরণ করিয়া তাহার সেই পন্থা অবলম্বন করি নাই। চাঁদের ডিঙ্গার নাম ও পুত্রগণের নাম আমি বংশীদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছি, এবং বেহুলার সাধনার কালে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাও কতকটা রূপান্তরিত করিয়া তাহারই কাব্যের আদর্শে রচনা করিয়াছি। অপরাপর বিষয়ে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দই আমার প্রধান আশ্রয় হইয়াছেন। স্থান নির্দেশ সম্বন্ধেও আমি এই কবিদ্বয়কেই অবলম্বন করিয়াছি। যখন বহু স্থানেই চাঁদ সদাগরের আবাসভূমি কল্পিত হইয়াছে, তখন যেকোন প্রাচীন কবিকে অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। এস্থলে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা।

বেহুলার শাশুড়ীর নামটি প্রাচীন পুঁথিতে 'শুলকা'রূপে উল্লিখিত। এই 'শুলকা' শব্দ 'শুক্লা' শব্দের অপভ্রংশ কি না এবং সনকা সেই অপভ্রংশের

রূপান্তর কি না এ সকল গূঢ়তত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আলোচ্য। গ্রন্থভাগের অপরাপর নাম সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আকার পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয়, যথা, কোন পুঁথিতে 'অমলা' কোনটিতে 'সুমিত্রা' ইত্যাদি।

হিন্দু গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানে যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেও সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই আমার চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি লালগোলার স্বনামধন্য রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়াকূল্য করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণের পুস্তকখানি আমূল পরিশোধিত হইল। সংশোধনের কার্য্যে আমি কলিকাতা হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. মহোদয়ের নিকট বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি, এজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৫
১৯ কাঁটাপুকুর লেন
বাগ বাজার, কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এইবার এই পুস্তক আমূল পরিশোধিত হইল। আশা করি এই উপাখ্যান বঙ্গদেশে চিরকালই আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিবে; ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমি একটি সামান্য প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। আধুনিক রুচিতে স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ যেরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাচীন একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের এই অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তের প্রতি বঙ্গসাহিত্যে অবহেলার ভাব না আসিয়া পড়ে, ইহাই প্রার্থনীয়। বেহুলা প্রায় সাত শত বৎসর কাল বঙ্গীয় নারী-সমাজের আরাধ্য হইয়া আছেন, এবং আশা করি চিরকালই থাকিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১৭ই মাঘ, ১৩২৪
বেহালা। ২৪ পরগণা

বে হু লা

১

পরম শৈব চাঁদ-সদাগর চম্পক নগরের অধিপতি ছিলেন। শিবের আদেশ ছিল যে, চাঁদ-সদাগর পূজা না করিলে, মর্ত্যলোকে মনসাদেবীর পূজা প্রচারিত হইবে না।

মনসাদেবী চাঁদ-সদাগরের পূজা পাইবার বিবিধ চেষ্টা করেন, কিন্তু পূজা করা দূরে থাকুক, চাঁদ-সদাগর তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

যখন সদয় ব্যবহারে চন্দ্রধরের প্রীতি আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইলেন, তখন মনসাদেবী তাঁহার সঙ্গে বিষম শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। চাঁদ-সদাগরের 'মহাজ্ঞান' বলিয়া একটা শক্তি ছিল, এই শক্তির দ্বারা তিনি সর্পদৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে, আরোগ্য করিতে পারিতেন; মনসাদেবী যখনই সর্পদ্বারা চাঁদ সদাগরের কোন পুত্রকে নিহত করিতে চেষ্টা পাইতেন, 'মহাজ্ঞান'-প্রভাবে পিতা তখনই তাহাকে রক্ষা করিতেন। সুতরাং প্রথম প্রথম মনসাদেবী বিরোধ করিয়া চাঁদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মনসাদেবী পরমা সুন্দরী রমণী সাজিয়া চাঁদ-সদাগরের মনোহরণ করিলেন; ছদ্মবেশিনীকে উদ্ভ্রান্ত বণিক্, মনসা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, কুহকিনীর বাক্য ও রূপচ্ছটায় চাঁদ 'মহাজ্ঞান' তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিলেন। 'মহাজ্ঞান' গ্রহণ করিয়া মনসাদেবী একটি দীপ-শিখার ন্যায় আকাশে মিলাইয়া গেলেন, চাঁদ সদাগরের ভবিষ্যৎ গাঢ়-তিমিরাবৃত হইয়া পড়িল।

কিন্তু চাঁদের একটি বৈদ্য-বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম 'শঙ্কর গারুড়ী।' গরুড় যেরূপ অহিকুলের শত্রু, ইনিও তদ্রূপ ছিলেন বলিয়া ইহার এই উপাধি। এই সুহৃৎ তাঁহার প্রাণপ্রতিম। বৈদ্যরাজ সর্প-দংশনের অমোঘ ঔষধ জানিতেন; যেমন বিষধরই দংশন করুক না কেন, এই বৈদ্য রোগীকে রক্ষা করিতে পারিতেন। চাঁদের পুত্রগণকে সর্পে দংশন করা মাত্র, এই সুহৃদের সাহায্যে তাহাদের জীবন রক্ষা পাইত।

দেবী প্রথমতঃ বৈদ্যরাজকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু যখন তাঁহার শত চেষ্টায়ও অকৃত্রিম সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ভগ্ন হইল না, তখন সুস্বদের জীবননাশের সংকল্প করিয়া, মনসা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বহুবার ব্যর্থকাম হওয়ার পরে, শেষে মনসাদেবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বিচিত্র কৌশলে মনসা শঙ্কর গারুড়ীর জীবন নষ্ট করিলেন।

এবার চাঁদ-সদাগর প্রকৃতই নিরাশ্রয়। 'যা করেন শিবশূলী' বলিয়া চন্দ্রধর স্বীয় সংকল্পে আরও দৃঢ় হইলেন।

বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে, একটি একটি করিয়া চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্র সর্প-দংশনে নষ্ট হইল।

চাঁদের শোকাতুরা স্ত্রী সনকা প্রতিদিন স্বামীর চরণতল নয়নজলে সিক্ত করিয়া দেবতার সঙ্গে এই বাদ পরিহার করিতে প্রার্থনা করিতেন, তরুণবয়স্কা ছয়টি বিধবা রমণী, ক্রূরকর্মা শশুরের দিকে সজলনেতে তাকাইয়া, তাহাদের শোকার্ত দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার চিত্ত কোমল করিতে চেষ্টা পাইত; বহুকালের প্রাচীন ভৃত্য 'নেড়া' এক হস্তে অশ্রু মুছিয়া অপর হস্তে গৃহের কাজ করিত ও প্রভুর পাদপদ্মে পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে ফুকারিয়া উঠিত। নানা দিগ দেশ হইতে সুহৃদ্‌গণ মনসার সঙ্গে এই বাদ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন–সেই বহুপুত্রের প্রিয়-কথোপকথন-স্নিগ্ধ, বাদানুবাদ-মুখর, লক্ষ্মীর প্রাসাদতুল্য বিশাল প্রাসাদ, শ্মশানের নির্জ্জনতা পরিগ্রহ করিয়াছিল; কিছুতেই চাঁদের বজ্রকঠোর পণ শিথিল হইল না, তিনি শোকার্ত হৃদয়ে, ভ্রূকুটি করিয়া, স্বীয় বিপুল হিন্তাল কাঠের লাঠিদ্বারা মনসাদেবীর এই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়া রহিলেন।

২

নিরানন্দ গ্রহে কিছুতেই মন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় না; সে গৃহের অবিরল অশ্রুধারা ও হাহাকারে চাঁদ-সদাগরের চিত্ত ব্যথিত হইল, তিনি সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ-সমাজ হইতে দুরে রহিলেন। তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ ও নিন্দাবাদ ক্রমশঃ অসহ্য হইল। তিনি বিদেশ-ভ্রমণে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে মনন করিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চট্টগ্রামের নাবিকগণ বিশাল সপ্তডিঙ্গা নানা বাণিজ্যের উপকরণে পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া আনিল। সদাগর বাণিজ্য-যাত্রায় যাইবেন, জয়ডঙ্কা বাজিতে লাগিল, নফর ও নাবিকগণ চম্পক-নগরে এই সংবাদ রাষ্ট্র করিল; সাত ডিঙ্গার মধ্যে 'মধুকর' নৌকা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নানা কারুকার্যখচিত, তাহা একখানি ভাসমান রাজপ্রাসাদের ন্যায়; এই 'মধুকরে' সদাগর আরূঢ় হইলেন; তখন দলে দলে চম্পক-নগরবাসী লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া সুদর্শন 'মধুকরে'র বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিতে লাগিল। নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিল। এই সময়ে অপর একটি দৃশ্য হৃদয়বিদারক, চম্পক নগরের প্রাসাদে

অশ্রুপূর্ণ মুখে বধূগণ-বেষ্টিত সনকা শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন; এই দুঃখের সংসারে পতি-সেবার জন্য তাঁহার যে বলটুকু অবশিষ্ট ছিল, আজ যেন তাহাও তাঁহার দেহে আর রহিল না।

কালীদহের বিপুল আবর্ত্তে পড়িয়া, সপ্ত ডিঙ্গা একান্ত বিপন্ন হইল। মনসাদেবীর আদেশে প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। কালীদহের ভীষণ আবর্ত্ত কর্ণধারগণের প্রাণে আশঙ্কা উপস্থিত করিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত জগৎ একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পরিপ্লাবিত হইল, মুষলধারে জল পড়িতে লাগিল ও ঝঞ্ঝাবাতে ডিঙ্গাগুলির ছৈ উড়িয়া গেল। সপ্ত ডিঙ্গা খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

চন্দ্রধর কালীদহের জলে ভাসিতে লাগিলেন; এই বিপদে তিনি 'শিব' 'শিব' বলিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

৩

কিন্তু চাঁদ-সদাগর মরিলে দেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইবে না। দেবী তাঁহার বসিবার সুবিস্তৃত পত্রসঙ্কুল শতদল চাঁদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, যেন সদাগর তাহা ধরিয়া ভাসিয়া থাকিতে পারেন। সম্মুখে ভাসমান পত্রসহ-পদ্মলতা দেখিয়া চন্দ্রর আশ্রয়ের জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন,–কিন্তু মনসার একনাম 'পদ্মা' সহসা ইহা মনে পড়াতে নামের সংস্রবহেতু ঘৃণায় হস্ত আকুঞ্চিত করিয়া, অকূল জলরাশিতে ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন।

কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া, চাঁদ তিন দিন পরে এক সমৃদ্ধ পল্লীর নিকটে উঠিলেন। নগ্নদেহ আবরণের জন্য শ্মশানের কাণি কুড়াইয়া কথঞ্চিৎ লজ্জানিবারণপূর্ব্বক বণিক্-রাজ সেই পল্লীতে প্রবেশ করিলেন।

সেই স্থানে সমৃদ্ধিসম্পন্ন চন্দ্রকেতু নামক বণিক্ বাস করিতেন। চন্দ্রকেতু চাঁদ-সদাগরের বাল্যসখা। এই দুঃসময়ে তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহারে অতিবাহিত করিয়। চাঁদ চন্দ্রকেতুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বাল্যসখার এই বিপদ্ দর্শনে চন্দ্রকেতু দুঃখিত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট আদরে আপ্যায়িত করিলেন; চাদের শরীর মার্জিত হইল, ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিয়া তিনি তিন দিনের অনাহারের পর ভোজন করিতে গেলেন। ভোজনের নানা আয়োজন হইয়াছিল; লুব্ধ বণিকের নেত্র খাদ্যদ্রব্যের উপর পতিত হওয়াতে, তাঁহার রসনা সরস হইল, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু সখার প্রতি সৌহার্দ্যবশতঃ তাঁহাকে মনসার সহিত কলহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন এবং এই প্রসঙ্গে উত্তেজিত চাঁদ সদাগরের সঙ্গে তাঁহার যে বাদানুবাদ হইল, তাহাতে সদাগর জানিতে পারিলেন যে, চন্দ্রকেতু একজন মনসার পূজক, এমন কি তাঁহার বাড়ীতে মনসার ঘট পূজিত হইয়া থাকে।

ক্রোধে চাঁদের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তখনও গণ্ডুষ করা হয় নাই, উপবাসী চাঁদ-সদাগর ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় আসন হইতে উত্থান করিয়া পরিত্যক্ত শ্মশানের কাণি পরিধানপূর্ব্বক সরোষে বন্ধুগৃহ ত্যাগ করিলেন; অনুনয়কারী বন্ধুর হস্ত দূরে সরাইয়া, একবারমাত্র সম্বণনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি"। বলা উচিত, চাঁদ মনসাদেবীকে 'কাণি', 'চেঙমুড়িকাণি' প্রভৃতি দুরক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন।

এই অবস্থায় চাঁদ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, সেই তণ্ডুলগুলি এক স্থানে সযত্নে রাখিয়া, তিনি স্নান করিতে গেলেন; স্নানান্তে তাহা নিজে পাক করিয়া, জঠরানল-নিবৃত্তি করিবেন।

কিন্তু তাহার অনুপস্থিতি-কালে মনসাদেবী গণদেবের মূষিক দ্বারা সেই তণ্ডুলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; ক্ষুধার্ত চাঁদ আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত পুঁটলীতে একটিমাত্র তণ্ডুলকণাও অবশিষ্ট নাই, তখন ক্রুদ্ধনেত্রে একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ছয় পুত্রের শোকে যে প্রাণ নষ্ট হয় নাই, অনাহারে এত সহজে তাহা যাইবার নহে, কিংবা তাঁহার পণ ভঙ্গ হইবার নহে–ইহাই অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিয়া মনসাদেবীকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

বিবিধ রসপূর্ণ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যে যিনি আত্মীয়-স্বজনকে নিত্য পুষ্ট রাখিয়াছেন, সেই বণিকুকুলচক্রবর্ত্তী দেশপ্রসিদ্ধ চন্দ্রধর নদীতীরে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। কতকগুলি কাঠুরিয়া সেই পথে যাইতেছিল; তাহারা চাঁদকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দরিদ্র মনে করিল এবং তাহাদের সঙ্গে বনে কাঠ কাটিলে তিনি লাভবান হইতে পারেন এই ভরসা দিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, সৌম্যকান্তি, শ্মশানের কাণি পরিহিত, প্রায় দিগম্বর বণিকরাজকে তাঁহার উপাস্যদেবতা চন্দ্রচূড়ের মতই দেখা যাইতে লাগিল।

চাঁদ, কাঠুরিয়াগণ অপেক্ষা কাষ্ঠ বেশী চিনিতেন। তিনি চন্দন কাষ্ঠের একটা প্রকাণ্ড বোঝা সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের অগ্রে অগ্রে নগরের হাটের দিকে যাত্রা করিলেন। মনসাদেবীর আদেশে অদৃশ্যভাবে বায়ুপুত্র সেই কাষ্ঠের বোঝার উপর পদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তাহাতে বোঝা এত ভারী হইল যে, চাঁদ আর তাহা মাথায় বহন করিতে পারিলেন না।

এইরূপে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া চাঁদ সদাগর এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পরিচারকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন; প্রভুর আদেশে আশুধায় নিড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মনসাদেবীর কুহকে চাঁদ ধান্য এবং তৃণ উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে

না পারিয়া, তৃণের পরিবর্তে কতকগুলি ধান্য উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণগৃহ হইতে তাঁহার জবাব হইল। বিমর্ষচিত্তে চন্দ্রধর জঙ্গলে ঘুরিতে লাগিলেন; একান্ত উন্মনাভাবে বিচরণ করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে মনসাকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে কতকগুলি ব্যাধ পক্ষী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিল, পক্ষীগুলি ফাঁদের নিকট আসিয়াছে, এমন সময়ে উদ্ভ্রান্ত সদাগরের অসাবধান পাদক্ষেপে ও অর্দ্ধোক্তিতে চমকিত হইয়া তাহারা উড়িয়া গেল। তখন ব্যাধগণ ক্রুদ্ধ-চিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল– "কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে, কোথা হইতে কাল তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে।"

সদাগর তাহাদের নিন্দাবাদ ও কটূক্তি শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহারা তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের মনোরম স্নিগ্ধ আলোক বনান্তভূমির শীর্ষে কিরীটের শোভা দান করিয়াছিল : পল্লী হইতে চাষাদের মেঠো সুরে ভাটিয়াল রাগিণী গীত হইয়া বনান্তে লীন হইয়া যাইতেছিল; নিবিড় বনরাজির ক্রোড় ত্যাগ করিয়া তমিস্রা সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছিল। শ্মশানের কাণি-পরিহিত কাঞ্চনপ্রতিম প্রৌঢ় দিগম্বর-মূর্ত্তি সদাগর আকাশপানে তাকাইয়া যুক্তকরে বলিলেন, "ভগবান, তোমার সেবক আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আর কিছু চাহে না; এই অত্যাচারে যেন তোমার প্রতি নির্ভর না হারাইয়া ফেলি। তোমার সেবার পরিবর্তে যে মণিময় হর্ম্ম্য ও রাজ্য-সম্পদ, প্রিয় পুত্রকলত্রলাভ–তাহা যেন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে না করি।" সেই নিবিড় বনপ্রদেশে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় চন্দ্রধর-বণিক্ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া মহেশ্বরের শ্রীচরণোদ্দেশে কয়েক বিন্দু অশ্রু, শুধু কয়েক বিন্দু অশ্রু-উপহার প্রদান করিলেন; একটি বিল্বপত্র ও একটি ধুত্তুর পুষ্পের সন্ধানে সদাগরের চক্ষু ইতস্ততঃ ধাবিত হইল, কিন্তু তথায় তাহা জুটিল না।

৪

চাঁদবেণে এই অবস্থায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সনকা, স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সাত ডিঙ্গা ডুবিয়া গিয়াছে–তাহাদের বড় সাধের 'মধুকর ডিঙ্গাখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জলমগ্ন হইয়াছে, শুনিয়া সনকা শোকবিহ্বলা হইলেন। লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে উপর্য্যুপরি বিপৎপাত হয়; নির্ব্বংশ সদাগরের গৃহে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পাদপদ্মের অলক্তকরাগ মুছিয়া যাইতেছে, 'মধুকর' ডিঙ্গার নাশে সনকা তাহারই আভাস পাইলেন, সনকা তাই কাঁদিয়া সদাগরের নিকট বিনাইয়া বিনাইয়া বারংবার শুধাইতে লাগিলেন–

"শুন সদাগর, কোথা মধুকর
কহ তব পায়ে পড়ি।

সদাগর নিজে যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সনকাকে বলেন নাই; কিন্তু সাধ্বী স্বামীর উন্নত, দর্পণোপম ললাটের কালিমা দর্শনে সেই কষ্টের ইতিহাস বুঝিতে পারিলেন। রাত্রিদিন সনকার মন জ্বলিতে লাগিল। তিনিও অশ্রুসিক্ত নেত্র উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মনসা দেবীকে বলিলেন, "আমরা তোমার প্রতি ভক্তি সদাগরের প্রাণে সঞ্চার করিতে পারিলাম না, এমন কাহাকেও আমাদের গৃহে আনিয়া দাও, যাহার চেষ্টায় এই অসাধ্য সাধন হয়, তোমার ঘট তুমি স্থাপিত করিয়া যাও। আমাদিগকে আর কত পরীক্ষা করিবে! আমাদের হৃদয় বড় দৃঢ়, পাষাণ হইলেও বুঝি তাহা এরূপ কঠোরাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইত।"

আবার সদাগরের বিশাল গৃহে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিয়াছে; প্রতিবাসিনীরা বলিয়া উঠিল, "ঐ যা, সনকা রাণীর আর-একটি পুত্র জন্মিল, উন্মাদ চন্দ্রধর মনসার সঙ্গে বাদ করিয়া এটিও হারাইবে।" "আহা! শিশুর কি চাঁদপানা মুখ।" সনকা সেই স্মৃতিকাগৃহে শিশুর শরচ্চন্দ্রনিভ প্রফুল্ল মুখখানি দেখিলেন; পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, শোকার্ত মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধ স্নেহ সেই শিশুর মুখদর্শনে তেমনি উথলিয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, এ পুত্রও মনসাদেবী রাখিবেন না। এক চক্ষের প্রান্তে আশঙ্কাজনিত অশ্রু পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতৃস্নেহ এমনই প্রবল যে, অপর চক্ষু শিশুর বদনচন্দ্রমা দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্ল হইল, যেন বহুদিনের জ্বালা সহসা জুড়াইয়া গেল। গৃহ হইতে লক্ষ্মী পাছে অন্তর্হিতা হন, এই ভয়ে সনকা ভীতা ছিলেন, লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার ফাঁদস্বরূপ পুত্রের নাম 'লক্ষ্মীন্দ্র' রাখিলেন, এই নাম আদরে আদরে শেষে 'লখাই' এবং আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া 'নখা'তে পরিণত হইয়াছিল।

চাঁদ-সদাগর পুত্রমুখদর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন; পুত্রের অসামান্য রূপদর্শনে তিনি ভীত হইলেন, এ পুত্র মনসার কোপানলে আহুতিস্বরূপ হইলে, তিনি কি করিয়া স্থির থাকিবেন? তিনি অহর্নিশ মহেশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতেন; দৈবজ্ঞ তাঁহাকে নিভৃতে বলিয়া গেলেন, বাসরঘরে 'দুর্লভ লখিন্দরে'র সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। ইহা শুনিয়া সদাগরের সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল; তিনি সংসারের সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে যে শান্তিময় স্থান আছে, অন্ধকারে রত্নান্বেষী ব্যক্তির ন্যায় তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। অবিরাম তাঁহার মুখে 'হর' 'হর' শব্দ ধ্বনিত হইত–পুত্রের অশুভ কথা তিনি সনকাকে জানাইলেন না, নিজে সেই মহাপরীক্ষার দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীন্দর কৈশোর অতিক্রম করিল। সনকা মায়ার ফাঁদে পা দিয়াছেন, দিবারাত্রি 'লখা'র জন্য কত শত অনুষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু চাঁদ-সদাগর পুত্রকে ততটা আদর করেন না, সনকা তাহাতে দুঃখিত হন। কিন্তু চাঁদ

যে কারণে লক্ষ্মীন্দরকে আদর করিতে যাইয়াও ফিরিয়া আসেন, তাঁহার পিপাসিত নেত্রদ্বয় যখন পুত্রমুখ-সুধা পান করিতে লালায়িত হয়, তখনও যে কারণে তিনি লোলুপ চক্ষুদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করেন, তাহা সনকা জানিতেন না; সুতরাং তিনি ভাবিতেন, স্বামী শোকে-দুঃখে উন্মনা ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের মত আর তাঁহার হৃদয় কোমল নাই, তিনি নির্ঘুম জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন।

নবযৌবনে লক্ষ্মীন্দর বণিক্-গৃহের দীপস্বরূপ হইল। একটিমাত্র দীপের জ্যোতিতে যেরূপ সমস্ত আঁধার ঘুচিয়া যায়, সেই বিশাল প্রাসাদ লক্ষ্মীন্দরের রূপ-গুণে তদ্রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীন্দরকে সেই গৃহের সকলে 'দুর্লভ নখা' বলিয়া ডাকিত; বড় দুঃখে, বড় কষ্টে ও বড় তপস্যায় 'নখা'কে পাওয়া গিয়াছে, এজন্য সে 'দুর্ল্লভ'।

নখা এখন নবযৌবনে উপনীত, সে নিজের জাতি-ব্যবসায় শিখিয়াছে; কাব্য, নাটক, অলঙ্কার পাঠ করিয়াছে; সে শুধু চন্দ্রধরের গৃহের গৌরব নহে, সে সেই বিশাল চম্পক-নগরীর গৌরবস্থল; যেখানে 'নখা' পদার্পণ করে, সেই স্থানের সকলের মুখে আনন্দের রেখা অঙ্কিত হয় তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেই লোকে কৃতার্থ বোধ করে। কেবল সদাগর সমস্ত ধর্ম-বুদ্ধির শক্তি সবলে হৃদয়ে উদ্বোধিত করিয়া লখাই হইতে একটু দূরে থাকেন–আদরের ধনকে আদর করিতে সাহস পান না, যাহাকে বক্ষে রাখিবেন, তাহাকে স্বীয় কক্ষে আনিয়া কথা বলিবার সময় মুখ অবনত করিয়া শিব স্মরণ করেন।

ছয়টি বধূ বিধবা; রমণীবর্গের মধ্যে একমাত্র সনকা মৎস্যাহারী। ছয়টি বধূর জন্য নিরামিষ হাঁড়ি উননে স্থাপিত হয়, দেখিয়া সনকার অন্নব্যঞ্জন মুখে রুচে না। নিজে যখন দুঃখরেখাকুঞ্চিত ললাটে সিন্দুর পরিতেন, তখন বধূগণের শুভ্রচন্দ্রোজ্জ্বল ললাট শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাদিয়া উঠিত। আর কাহাদের লইয়া সন্ধ্যাকালে কেশবিন্যাস করিবেন! আর কাহাদের কপালে সিন্দুরবিন্দু আঁকিয়া দিবেন! আর কাহাদের তাম্বুলরঞ্জিত প্রিয় ওষ্ঠাধর দেখিয়া পুলকিত হইবেন!

শাঁখারীকে বৎসরান্তে কাহাদের জন্য নানাপ্রকার কারুখচিত শাঁখার কথা বলিয়া দিবেন! যাহাদের লইয়া এই সকল আনন্দলীলায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহারা সিন্দুরের কৌটাটি দেখিলে লুকাইয়া যে অশ্রুবিন্দুটি অঞ্চলাগে মুছিয়া ফেলে, সনকার তীক্ষ্মদৃষ্টি তাহা এড়ায় না; সনকা কিছু না বলিয়া তখন নিজের প্রকোষ্ঠে যাইয়া একা-একা কাঁদিতে থাকেন, হয়ত সেদিন তাঁহার কিছু খাওয়া হয় না। সুবর্ণ-চিরুণী দিয়া স্বীধ কেশ আঁচড়াইতে যাইয়া সনকার চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে। হায় বিধাতঃ! প্রৌঢ়া যাহা কর্তব্যের দায়ে করিয়া থাকেন, তাহা যে যৌবনের পক্ষেই শোভন; সুন্দরী যুবতীরা গৃহে তপস্বিনীর এত সাধন করিবেন,

আর প্রৌঢ়া কি করিয়া তাম্বুল ও মৎস্য ভোগ করিবেন, স্বর্ণচিরুণীতে কেশ আঁচড়াইবেন! অথচ তাহা না করিলে নয়।

সনকা একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার দুর্লভ নখার একটি বউ আনিয়া দেও, লক্ষ্মী বউ অলক্তক-রঞ্জিত নূপুরমুখর ক্রীড়াশীল পদে এই গৃহে বিচরণ করিবে, আমি সেই প্রিয় শব্দ শুনিব এবং আঙ্গিনায় সেই অলক্তক-চিহ্ন দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, আমার স্বর্ণকৌটা-ভরা সিন্দুর আমি তাহার সুন্দর কপালে পরাইয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব।"

সহসা পথিক সর্পের দেহ স্পর্শ করিলে যেমন চমকিয়া উঠে, এই প্রস্তাবে চাঁদ-সদাগর তেমনই চমকিয়া উঠিলেন। বাসর-ঘরের আতঙ্ক তাঁহার মনে উপস্থিত হইল; তিনি সনকার প্রার্থনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সনকা দাঁড়াইয়া রহিলেন : তখন নদীনীর-সিক্ত পবন গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলাগ্র যেন সস্নেহে স্পর্শ করিতেছিল, পশ্চিমাকাশের নীলিমা ভেদ করিয়া 'শুকতারা' স্বামী-উপেক্ষিতার গণ্ড-প্রবাহিত অশ্রুধারাকে উজ্জ্বল করিতেছিল–তাহার এত সাধের 'লখা'কে এরূপ নির্মমভাবে স্বামী উপেক্ষা করিলেন, সনকার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত দুঃখ আজ উথলিয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লখাই পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যাকালের আহার্য্যের জন্য মাতাকে খুঁজিয়া চলিয়া গেল, সনকা তাঁহার 'মা' মা' আহ্বান শুনিতে পাইলেন না। এক প্রহর কাল এইভাবে অতিবাহিত হইল, সনকার হৃদয়ের ব্যথার হ্রাস হইল না। পুত্রশোকে যিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন, আজিকার দুঃখে তিনি নীরব রহিলেন।

এইরূপ দুঃখ সম্পূর্ণ অভিনব, ইহাতে তিনি অভ্যস্ত নহেন, শুধু গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, আর নৈশনক্ষত্র গবাক্ষপথে সেই উপেক্ষাসম্ভূত অশ্রুবিন্দুকে স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিতেছিল; রোরুদ্যমানার বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

চাঁদ বাহিরের দরবার ছাড়িয়া যখন রাত্রিতে স্বপ্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, নীরবে অশ্রুমুখী সনকা দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া সনকা তাঁহার আহার্য্য-সন্ধানে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন; চাঁদ তাঁহাকে আদরের সহিত সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, "তুমি কি সেই হ'তে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?" স্বামীর আদরে সনকার চক্ষু হইতে দরদর-প্রবাহে জল পড়িতে লাগিল, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

চাঁদ-সদাগর অভিমানিনীর মনের ব্যথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দৈবজ্ঞের কথা সনকাকে বলিলে পুত্রবৎসলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। দৈবজ্ঞের কথা

যে ফলিবে, তাহার বিশ্বাস কি? লখার বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আশঙ্কা হইয়াছিল, তিনি কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

নিজের কোঁচার খুঁটে সনকার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, মনসাদেবীর প্রতিকূলতা এখনও আছে; ছয়টি বিধবা বধূ যে গৃহকে শ্মশান-সমান করিয়া রাখিয়াছে, সেই গৃহে অন্য একটি বধু আনিতে তাঁহার সাহস হয় না, সেই সুখ যদি প্রতিবাদী দেবতার বুকে না সহে।

সনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি লখাকে আদর কর না, এ কষ্ট আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমার বড় দুঃখের ধন লখা, তুমি তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহ না, তুমি নির্ম্মম; বাছাকে কি চিরকাল অবিবাহিত রাখিবে? মনসাদেবী আর কষ্ট দিবেন না; লখার বউ ঘরে না আসিলে, আমার এই শূন্য ঘর কে পূরণ করিবে? আমার বড় সাধ, বধুর সহিত লখাকে লইয়া আবার সংসার পাতি–তুমি বাদী হইও না।" এই বলিয়া সনকা অশ্রুপূর্ণনেত্রে চাঁদ-সদাগরের পদতলে নিপতিত হইলেন।

চাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন,–"দৈবজ্ঞের কথা যে নিশ্চয় ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আর বাসর ঘরের ব্যবস্থা আমি এমন করিব যে, মনসা প্রতিকূল হইলেও কিছু না করিতে পারে। এই হতভাগিনী দুঃখিনীর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না।'

সযত্নে সনকাকে উঠাইয়া চাঁদ বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না, পুত্রবধূ ঘরে আনিব। কুলপুরোহিত জনার্দনকে ডাকিয়া উপযুক্ত বধুর সন্ধান দেখ।"

তখন নিছনি-গ্রামের বণিক্ সায়-সদাগরের কন্ঠা বেহুলা প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা হইয়া উঠিয়াছে; বেহুলার কণ্ঠস্বর কোকিলের মত, বেহুলার ন্যায় কোন নর্তকীও নাচিতে পারিত না, বেহুলা রন্ধনকার্য্যে সিদ্ধহস্তা ও সুলেখিকা, আর বেহুলার রূপ দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র মলিন হইয়া যাইত, নিতম্বলম্বিত কুন্তলরাজি দেখিয়া কাদম্বিনী আকাশের প্রান্তে লুকাইত। বেহুলাকে 'প্রতিবাসিগণ 'ক্ষেপা মেয়ে' বলিয়া ডাকিত; এই মেয়ে যেখানে যাইত সেখানে তাহার কথা লোকে শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লইত, তাহার সরল বুদ্ধির কথায় অনেক গৃহস্থের কূটদ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত–যেখানে বেহুলা থাকিত, তাহার নৃত্যগীতে সে স্থানে আনন্দের উৎস ছুটিত, লোকে আদর করিয়া তাহাকে 'বেহুলা নাচুনি' বলিয়া ডাকিত।

বস্তুতঃ বেহুলা অপরাপর বালিকার মত ছিল না। সে সংসারে থাকিয়া যেন কোন স্বর্গের কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত; সমবয়স্কা বালিকাগণ যখন দেখিত, বেহুলা যোগিনীর ন্যায় কর্ণে কুণ্ডল[১] পরিয়া সন্ধ্যাকালে নদীতীরে উর্দ্ধ নেত্রে

১. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সর্বত্রই কুণ্ডলধারণ যোগিনীর অপরিহার্য্য কর্তব্য বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়।

একা বসিয়া আছে–ঠিক একখানি নিশ্চল চিত্রের ন্যায়, তাহার একগাছি কেশও বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে না–তখন সেই পুণ্যবর্ত্তী ধ্যানশীলার চিন্তাস্রোত ভঙ্গ করিয়া তাহারা কথা কহিতে সাহস পাইত না, স্থির হইয়া তাহার পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া কখনও কোন বিধবার শোক-লুণ্ঠিত শিরোদেশ নিজ অঙ্কে থাকিত। রাখিয়া, বেহুলা তাঁহার আলুলায়িত কুন্তল মার্জ্জন। করিতে করিতে দুই-একটি অশ্রুবিন্দু পাত করিত, তখন তাহাকে ঠিক একটি দেবতার ন্যায় দেখাইত; শোকার্তার বিহ্বল চক্ষু তাহার দিকে পড়িলে সে মনে ভাবিত, তাহার দুঃখ যেন স্বর্গের কোন করুণাময়ী দেবীর বুকে বাজিয়াছে; তিনি স্বর্গের সুখ ত্যাগপূর্ব্বক তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বেহুলা কথা বলিত না, কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ করুণার ভাবে অপূর্ব্ব শান্তি বিতরণ করিত।

কখনও কোন জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চক্ষে বেহুলা দেখিত, সতী স্বীয় উজ্জ্বল ললাটদেশ সিন্দুর-রঞ্জিত করিয়া কোন স্বর্গলোক দেখিতে দেখিতে স্বামীর পার্শ্বে 'পুড়িয়া ছাই হইতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া বেহুলার গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, যে পুণ্যলোকে সতী চলিলেন তাহা বেহুলার চক্ষে যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হইত।

কখনও সীতার কষ্টের কথা পড়িতে পড়িতে শিশিরাপ্লুত পদ্মদলের ন্যায় তাহার চক্ষু ভারাক্রান্ত ও রক্তিম হইত; কিন্তু যখন সাবিত্রী কিরূপে মৃত স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, মৃত্যুর নিকট হইতে তাঁহার জীবন পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন, বেহুলা সেই কাহিনী পাঠ করিত, তখন সেই পুণ্যময়ী সতীর ভাব তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত, বালিকা একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে যখন বালিকা 'অরক্ষণীয়া' হইয়া উঠিয়াছে, তখন সায়-বেণে বর খুঁজিতে খুঁজিতে পাত্রীসন্ধানে-ভ্রমণশীল জনার্দ্দন শর্মার মুখে চাঁদ সদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের কথ! জানিতে পারিলেন।

চাঁদ-বেণে স্বর্ণ-চতুর্দোলায় চাপিয়া নিছনি নগরে আসিলেন। কন্ঠাকে 'পাকা দেখা' হইবে–একশত ভারী তত্ত্ব লইয়া চলিল : সন্দেশ,

মুড়কি, চিপীটক, রসাল পানের বাঁড়া, ঝালের লাড়ু, চাপাকলা, প্রভৃতি নানা খাদ্যদ্রব্য, ঢাকাই ও বারাণসী শাড়ী, উড়িষ্যার বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার, বহুমূল্য হীরার হার, মণি-খচিত স্বর্ণচিরুণী প্রভৃতি লইয়া পরিচারকেরা আগে চলিয়া গেল।

চাঁদ সায়-বেণের গৃহে পরম আদরে আপ্যায়িত হইলেন। মেয়ে দেখিয়া চাঁদের চক্ষু জলপূর্ণ হইল; মেয়ে ত নয়, এ যেন পদ্মাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণী ভূতলে দাড়াইয়াছেন,–পায়ের আলতা নহে, উহা রক্তপদ্মের প্রভা। এই বন্ধুকে

পাইলে সনকার প্রাণ সত্য সত্যই জুড়াইবে; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে, আবার সংসারের মায়া-বন্ধনে ধৃত হইতেছেন ভাবিয়া, সদাগর নীরবে হৃদয় হইতে সাংসারিক সুখের আশা সরাইয়া ফেলিলেন। রক্তচন্দনের ফোটা ললাটে ছিল, রক্তপট্টবাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'শিবদুর্গা' স্মরণ করিয়া চন্দ্রধর মুহূর্তের জন্য সংসারের উর্দ্ধে শান্ত সমাধিতে স্থিত হইলেন।

চাঁদ সায়-বেণেকে বলিলেন, মেয়ে তাঁহার মনোনীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের একটা কৌলিক প্রথা আছে, কন্যাকে তদনুসারে পরীক্ষা করিতে হইবে– লৌহনির্মিত কলাই রন্ধন করিয়া কন্ঠা পরিবেশন করিবেন। কন্যা যদি লক্ষ্মী হন তবে লৌহের কলাই ডালের মত গলিয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া বেহুলার মাতা অমলা কাঁদিতে লাগিলেন; এমন কথা কে কোথা শুনিয়াছে? লৌহের কলাই অগ্নিজ্বালে কে কবে গলাইয়াছে? সায়-সদাগর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বেহুলা আসিয়া বলিল, "তোমরা ভয় পাইয়াছ কেন? আমি বারমাসে বার ব্রত করিয়া থাকি, প্রতি অমাবস্যায় উপবাসী থাকিয়া মনসাপূজা করিয়া আসিয়াছি, দেব-প্রসাদে আমি লৌহের কলাই সিদ্ধ করিয়া ফেলিব।"

কাঁচা মাটির তিনট! ঝিক্ গড়িয়া নূতন উনন প্রস্তুত করা হইল; ছয় গণ্ডা লৌহের কলাই আনিয়া নূতন হাঁড়ীতে পুরিয়া সেই হাঁড়ী জলপূর্ণ করা হইল। বেহুলা মনসাদেবীকে স্মরণ করিয়া উননে আড়াই মুড়া জ্বাল দিয়া আগুন জ্বালিলেন, দেখিতে দেখিতে লৌহ-কলাই সিদ্ধ হইয়া গেল। অমলা ও সায়-বেণে বিস্ময়ে ভাবিলেন, 'আমাদের গৃহে কন্যারূপিণী এ কে?' সহচরীরা ভাবিল, 'আমাদের সঙ্গে যিনি খেলা করেন, তিনি অসামান্যা, আমাদের মতন নহেন'; প্রতিবাসীরা বলাবলি করিল, "এ ক্ষেপা-মেয়ে কোন শাপভ্রষ্টা দেবী।" চাঁদ সদাগর বুঝিলেন, এ ক্যা লক্ষ্মীন্দরের যোগ্য। গণক আসিয়া বর-কনের রাশি মিলাইয়াও তাহাই বলিয়া গেলেন।

৭

চাঁদ গৃহে আসিয়া বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অপরাপর উদ্যোগ অন্যহস্তে অর্পিত হইল; স্বয়ং চাঁদ, সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহের বাসর নির্মাণ করিতে কামিলা নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই লৌহগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। প্রকাণ্ড লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ উত্থিত হইল। সাঁতালী-পর্ব্বতের প্রস্তর খুঁড়িয়া লৌহময় ভিত্তি নির্ম্মিত হইল, তদুপরি লৌহের তোরণ মেঘ স্পর্শ করিয়া রহিল, এবং বিশাল লৌহগৃহ যমপুরীর কারাগৃহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই গৃহের বহির্দেশে শত শত শাস্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত

রহিল। বহুসংখ্যক নেউল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সেই বিশাল লৌহপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখাগ্রে সর্পদেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উন্নত হইয়া রহিল। নেউলদিগের শ্রেণী হইতে ঈষৎ দূরে ইন্দ্রাযুধতুল্য পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া শিখিগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাদের পদাঙ্গুলী ও চঞ্চু সর্প ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সাঁতালী-পর্ব্বতের গাত্রে তৃণশষ্প ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বৃক্ষমূল ও লতাগুল্ম বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের তীব্রগন্ধে সর্প-সমাজ সাঁতালী-পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া দূরদূরান্তরে প্রস্থান করিল।

মনসাদেবী আকাশ হইতে এই দৃঢ়রক্ষিত পর্ব্বতদুর্গ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন।

তিনি লৌহের বাসর-ঘর-নির্মাতাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "একটি কেশ প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র লৌহের গৃহ-দেয়ালে রাখিতে হইবে।" কামিলা, দেবীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে সদাগর বেতন ও পুরস্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এখন যন্ত্র লইয়া কোন্ ছলে সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিব।" দেবী তাহাকে ভয় দেখাইলেন, এমন কে দৃঢ়চেতা পুরুষ আছে যে বিষহরী দেবীর ক্রোধকে ভয় না করে? কামিলা সম্মত হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া গৃহ দেখিবার ছলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রস্তুত করিল এবং তাহা কয়লার গুঁড়া দিয়া পূর্ণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

লক্ষ্মীন্দর বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের অভাব নাই; হস্তী, অশ্ব ও চতুর্দোলে আরূঢ় শত শত আত্মীয় লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে যাত্রী হইলেন। বরযাত্রিগণের বিচিত্র স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ, উষ্ণীষের মণি ও হীরার হারের জ্যোতিতে নিশাকালে যেন সৌরকিরণ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহুমূল্য মুকুট মস্তকে পরিয়া, লক্ষ্মীন্দর যেমনই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, চৌকাঠে তাঁহার মুকুট ঠেকিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল–চোপদার অমনি তাহা উঠাইয়া মাথায় পরাইয়া দিল। এই অশুভ ঘটনা সনকা প্রত্যক্ষ করেন নাই, চাঁদ-সদাগর দেখিয়াছিলেন, আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল।

তিন সহস্র গন্ধবণিক, তন্মধ্যে চৌদ্দ শত কুলীন, বরযাত্রী হইয়া চলিলেন; তিন শত ভাট সেই বিবাহের গান রচনা করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল; বহুসংখ্যক মালী, তের শত গাবর, পট্টবস্ত্র-পরিহিত সাত শত ধোপা, বহুসংখ্যক বাঘকর, নাপিত, তাঁতি, যোগী ও সপ্ত সহস্র বিদ্যুৎ-বাজিকর' নিছনি নগরের অভিমুখে চলিল; স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোলা সাত শত এবং সত্তরখানি স্বর্ণপালঙ্ক এই মিছিলের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। গজমুক্তার ঝালরে শোভিত আস্তরণমণ্ডিত গজরাজে আসীন চন্দ্রধর সুহৃৎ ও অন্তরঙ্গ বেষ্টিত হইয়া

যাত্রা করিলেন; শত শত মশালচি সেই দলের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল, মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষ! সুদর্শন গন্ধর্ব্ব রাজকুমারের ন্যায় লক্ষ্মীন্দর অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। তাঁহার মস্তকে মণিময় মুকুট, কণ্ঠে লবঙ্গ, রজন ও বকুল ফুলের মালা মুক্তাহারকে সুগন্ধ-বিশিষ্ট করিতেছে, হস্তে শুভবিবাহচিহ্ন দর্পণ, কাটারী ও তরুণ কদলীমঞ্জরী, মুকুটশীর্ষে চণ্ডীর নির্মাল্য ও স্বর্ণময় উত্তরীয়প্রান্তে মাতৃদত্ত একটি লেবু বাঁধা।

১ উৎসবকালে যে সকল বাজি পোড়ান হয়, তাহার নিম্নাতাদিগকে প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যুৎ-বাজিকর সংজ্ঞার অভিহিত করা হইয়াছে।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ও লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে দেখিয়া মনে করিল, তাহারা হাতে চাঁদ পাইয়াছে। সেই শুভলগ্নের মুহূর্ত্তকালব্যাপী সুখ তাহারা দুর্লভ মনে করিল; একমুহূর্তে যে সুখের আস্বাদন পাইল, তাহা ছাড়া জীবন মরু হইয়া যাইবে, অথচ মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে আনন্দের কণাও তাহারা জানিত না। মুহূর্ত্তমধ্যে জীবনের একটা অধ্যায় আরম্ভ হইল, তাহা একেবারে নূতন।

অমলা জামাতাকে বরণ করিয়া লইলেন, সোনার প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া অমলা স্নেহপূর্ণ-দৃষ্টিতে জামাতার মুখখানি দেখিলেন। তাঁহার ছয়টি পুত্র ছিল, সেই দৃষ্টির সঙ্গে যেন লক্ষ্মীন্দর তাঁহার প্রিয়তম সপ্তম পুত্রের স্থলে অভিষিক্ত হইল।

অমলার শয়নগৃহ অতি পরিপাটি, তাঁহার গুন্তের ঊর্দ্ধে ব্যাঘ্রমুখ–নৃত্যশীল শারিকাদের বিহারস্থান। গৃহের ছাদ আকাশস্পর্শী, গৃহটির নাম 'উদয়তারা'। উদয়তারার ছাদের সঙ্গে সংলগ্ন, মণিমুক্তার ঝালর-বিশিষ্ট, মুক্তাশ্রেণীগ্রথিত শতদল ও বিবিধ পুষ্পপল্লবাঙ্কিত বিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; সেই চন্দ্রাতপের অধোভাগে হেমছত্র প্রসারিত ছিল, তাহার নিম্নে রক্তপট্টবস্ত্রপরিহিত লক্ষ্মীন্দর পুষ্পমাল্য গলে পরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বামভাগে বেহুলার স্বর্ণখচিত অঞ্চলাগ্র তাহার উত্তরীয়-প্রান্তে আবদ্ধ ছিল। যখন লক্ষ্মীন্দর মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা সেই হেমছত্র ভাঙ্গিয়া দম্পতির মাথায় পড়িল। বিবাহ-সভায় 'কি হইল?' 'কি হইল?' বলিয়া একটা পরিতাপ-সূচক কলরব উত্থিত হইল। অমলা বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সায়-বেণে সেই হেমছত্র পুনরায় সুদৃঢ় করিয়া উত্থিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিসাধু পুরললনাগণের কাতরোক্তি ও আক্ষেপ থামাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সভা হইতে একটু দূরে যাইয়া হিন্তালের যষ্টি হস্তে উন্নতদেহ তেজঃপুঞ্জ সদাগর দুইটি শঙ্কাপূর্ণ চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মহেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিবাহান্তে চাঁদ-সদাগর সায়-বেণেকে বলিলেন, "আমি এখনই পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া চম্পকনগরে যাত্রা করিব।" বিবাহের রাত্রি

কন্যার পিতৃগৃহে অতিবাহিত করাই বরের চিরাগত প্রথা। সায়-সদাগরের মাতুল বর্দ্ধমানের নীলাম্বর দাস ঘোর আপত্তি উত্থাপিত করিলেন; চাঁদ-সদাগরের খুল্লতাত লক্ষপতির জামাতা ধনপতিও চাঁদের এই প্রস্তাব বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া বাঁকিয়া বসিলেন! এদিকে অমলাপ্রমুখ নিছনি-নিবাসিনী রমণীকুল এই অনুচিত প্রস্তাবে বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

চাঁদ, বেহাইকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার করধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ তাহার নয়ন হইতে অজস্র জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। সায়-বেণে তাঁহার এই ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। চাঁদ বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বেহাই! আমার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু যে কষ্টে আমার চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইয়াছে তাহা সামান্য নহে। বিবাহের বাসরগৃহে আমার পুত্রের সর্পদংশনে জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, দৈবজ্ঞেরা ইহাই গণিয়া বলিয়াছেন। আমার ছয়টি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মনসার সঙ্গে আমার বাদবিসংবাদের কথা আপনারা অবগত আছেন। আমি চম্পকনগরের সীমান্তে সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহনির্ম্মিত সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণ করিয়াছি, অদ্য রজনী পুত্র ও পুত্রবধূকে সেই গৃহে রাখিব। এই বিপদ কাটিয়া গেলে, লখা বধুকে লইয়া এখানে আসিবে, এবং যত দিন আপনারা ইচ্ছা করিবেন, তত দিন থাকিয়া যাইবে, সে ত আপনাদের সন্তান হইল।"

সায়-বেণে দুঃখের সহিত বলিলেন–"আপনি এ সকল কথা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন কেন? এমন জানিলে কে এমন স্থলে তাহার দুহিতার সম্বন্ধ করিতে সম্মত হইত?"

৮

চাঁদ-সদাগর, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতে লৌহগৃহে রাখিলেন। স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় যষ্টি হস্তে সেই গৃহের শাস্ত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

সেই লৌহগৃহে প্রবেশ করিতে সহসা বেহুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সহসা অসাবধান হস্তক্ষেপে বেহুলা নিজের সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলিলেন–আশঙ্কায় অশ্রুমুখী বেহুলা, জলভরা একখানি রৌদ্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় রূপচ্ছটায় গৃহ আলোকিত করিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া নিজেই আবার সিন্দুর পরিলেন।

বেহুলা, দৈবজ্ঞের গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রঙ্গন-ফুলের মালাটি তাঁহার বক্ষের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া চন্দনদীপ্ত মূর্ত্তিকে

বনদেবতার ন্যায় সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মালাটি যথাস্থলে বিন্যস্ত করিবার জন্য ভীরু বালিকা হস্ত প্রসারিত করিয়া যেমনই, স্বামীদেহ স্পর্শ করিয়াছে, অমনই লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল–"আমার নয়নের তারা, প্রাণের প্রতিমা, একবার আমার বাহুবন্ধনে ধরা দাও," বলিয়া লক্ষ্মীন্দর তাহাকে নিকটে আসিতে বলিল। লজ্জাবতী দূরে সরিয়া গেল, সে ধরা দিল না; লক্ষ্মীন্দর পুনশ্চ ঘুমাইয়া পড়িল।

বিনিদ্রচক্ষে বসিয়া বেহুলা স্বামীর রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন; আবার লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল; সে চাহিয়া দেখিল, একখানি স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছে। লক্ষ্মীন্দর বলিল, "দেখ, আমার বড় ক্ষুধাবোধ হইতেছে, আমায় যদি চারিটি ভাত রাঁধিয়া দিতে পার।"

এই বলিয়া লক্ষ্মীন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেহুলা এত রাত্রে সেই গৃহে কেমন করিয়া ভাত রাঁধিবেন! বরণ-ডালায় শুভঘট ছিল, তিনটা নারিকেল দিয়া উনন প্রস্তুত করিলেন, সেই শুভঘট নারিকেলের জলে পূর্ণ করিয়া, বরণডালার তণ্ডুল লইয়া তাহাতে পুরিলেন, স্বীয় স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্রের আঁচল ছিঁড়িয়া, উননে অগ্নি জ্বালিয়া বেহুলা ভাত রাঁধিতে লাগিলেন।

এদিকে, আকাশে এক নিবিড় মেঘগৃহে মনসাদেবী উপবিষ্ট হইয়া সর্পগণকে স্মরণ করিলেন। সেই গৃহের শীর্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কা-শিখা পতাকার ন্যায় ঊর্দ্ধে ছলিতেছিল। সর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্ব্বত্র ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনসার আহ্বানে দিক্‌দিগন্ত হইতে সর্পসমূহ তথায় ছুটিয়া আসিল–তাহারা কেহ একশীর্ষ, কেহ বহুশীর্ষ, কাহারও দেহ চক্রাকৃতি বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত, কাহারও শরীর শুধু স্বর্ণরেখাময়। বিড়ঙ্গিণী, তক্ষক, বঙ্গদাড়া, শঙ্কর, তালভঙ্গ প্রভৃতি অসংখ্য সর্প তথায় উপস্থিত হইল, তাহাদের গতিতে মরুৎ মন্থর প্রতিপন্ন হইল, সংহারিকা শক্তি ও চাঞ্চল্যে বিদ্যুৎ পরাস্ত হইল।

লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিতে কে যাইবে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পকুল মাথা হেঁট করিল। একটা কোপনস্বভাব রক্ত-চক্ষু সর্প বলিল, "সাঁতালী-পর্ব্বতে যে সকল তরুমূল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার গন্ধ দূর হইতে পাইয়া আমার হাঁপানি রোগ জন্মিয়াছে।" বিষদন্ত বিকাশ করিয়া ত্রিশীর্ষ মহিজঙ্গ বলিল, "ময়ূর ও নকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? তাহাদের ভয়ে আমার মাতুল ভ্রাতারা বহুপুরুষের বাসস্থান সাঁতালী ছাড়িয়া নীলগিরিতে আশ্রয় লইয়াছে।" দংশক সর্প রোষাবিষ্ট চক্ষু আবর্তন করিয়ী বলিল, "চাঁদ-সদাগর জগতের যত রোঝা সাঁতালী-পর্ব্বতে জড় কারয়াছে, তাহারা যেখানে গর্ভ পায়, সেইখানেই মন্ত্র পড়ে ও তরুমূল নিক্ষেপ করে, অহিকুল গর্ভের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহ-গৃহের একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু যে-সকল শাস্ত্রী পাহারা দিতেছে,

তাহারা এক-এক জন চণ্ডু ও আফিম এক এক ভরি এক-এক বারে খাইয়া চক্ষু এমন রক্তবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিলে আমাদেরই ভয় হয়, তাহাদের দাঁতে যে বিষ জমিয়াছে, তাহাতে আমাদেরই মৃত্যু হইতে পারে, অন্ততঃ আমাদের বিষে তাহাদের কিছু হইবার নয়। তাহারা মাথা নীচু করিয়া না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাইলে আমরা বাঁচিব না।"

মনসাদেবী পুনর্ব্বার বলিলেন–"আমি এ সকল ভীরুর বাক্য-কৌশল শুনিতে চাহি না, অহিকুলে কি এমন কেহ নাই, যে সমস্ত বিপদ অগ্রাহ করিয়া লক্ষ্মীন্দরের বাসর-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে দংশন করে? যে-সকল বিপদ পথে আছে, তাহা সকলেই অবগত, অশক্তগণের মুখে তাহা আমি শুনিতে চাহি না। যে বিপদে নির্ভীক, সে-ই অগ্রসর হউক।"

তখন ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজসর্গ অগ্রসর হইল এবং নীরবে দেবীর প্রসাদ-চিহ্ন পানে মাথা ঠেকাইয়া সাঁতালী-পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল।

তখন বেহুলা-সতী অন্ন রন্ধন করিতেছিলেন; সেই কাল-রাত্রিতে চারিদিক হইতে কি একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল, চাঁদ-বেণে গৃহের চারিদিক ঘুরিয়া মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, এ কি তাহারই প্রতিধ্বনি? সহসা বেহুলা দেখিলেন, লৌহের দেয়ালে একটা স্থানের লৌহপিণ্ড টুটিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে লৌহচূর্ণ খসিয়া পড়িতেছে; বলা বাহুল্য, সেগুলি কয়লার গুঁড়া। সেই ছিদ্র-পথে ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ প্রবেশ করিল। বেহুলা সোনার বাটীতে কাঁচা দুগ্ধ ও রামরক্তা রাখিয়া সেই সর্পের সম্মুখে ধারণ করিলেন, আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেঁট করিয়া বাটীতে মুখ প্রবেশ করাইল–বেহুলা সোনার সাঁড়াশি দ্বারা তদবস্থায় সর্পকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে কালদন্ত সর্প এবং তৃতীয় প্রহর রাত্রে উদয়কাল সর্প সেই ভাবেই বন্দী হইল–শেষরাত্রে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ভাত খাইতে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীন্দর গভীর নিদ্রাভিভূত, কোন সাড়া দিল না।

সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা ও শ্রমে উপবাসী বেহুলা ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বন্দী সর্পত্রয়কে একটা বৃহৎ পাত্রদ্বারা চাপা রাখিয়া, বেহুলা স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষু দু'টি ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, এক একবার চক্ষু বিস্ফোরিত করিয়া তিনি সেই রন্ধ্র-পথের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং ঘুমে হেলিয়া পড়িতেছেন; এমন সময় বায়ুগতি কালনাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিল–সেই গৃহপ্রবেশ কালে হঠাৎ "কেও"–স্বরে কালনাগিনী অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল–ক্ষণকাল সে নড়িল না। কে জানে কেন বিনিদ্র চাঁদ সেই সময়ে কোন গূঢ় অনিষ্টের আশঙ্কায় "কেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

কিছুকাল নিশ্চল থাকিয়া কালনাগিনী আবার চলিল, তখন বেহুলা ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া স্বামীর পদ-পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নিদ্রিত ললাটে একটা দুশ্চিন্তার রেখা জাগিয়া আছে।

দ্রুত-গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল, এই সময়ে নিদ্রাবেশে পাশ ফিরিতে যাইয়া, লখার পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল, অমনই কালনাগিনী উদ্যত-ফণা হইয়া তাহাকে দংশন করিল, লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল–

"জাগ ওহে বেহুলা সায়-বেণের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি?"

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী দ্রুতগতিতে রন্ধ্র-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে–অমনি কাটারি দ্বারা তাহার অষ্টাঙ্গুলি প্রমাণ পুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন–পুচ্ছহীন! কালনাগিনী তড়িৎ-গতিতে পলাইয়া গেল।

তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে; সনকা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সাঁতালী-পর্ব্বতে হৈমবতীর ন্যায় আশীষহস্তে দণ্ডায়মানা, ত্রিশূলধারী মহাদেবের ন্যায় সেই দ্বারদেশে হিন্তালের যষ্টি হস্তে ভাই কিরণোজ্জ্বল উন্নতকায় চন্দ্রধর চিত্রপটের ন্যায় স্থির। রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে :–চন্দ্রধর ভাবিতেছেন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার বক্ষ কেন ঘনঘন কম্পিত হইতেছে, নেত্রদ্বয় কেন ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে?

৯

এমন সময়ে সনকা সেই গৃহমধ্যে অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া ব্যাকুলা হইলেন, তাঁহার সঙ্গিনীগণ দ্বারে আঘাত করিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল–বেহুলা কালনাগিনীকে অনুসরণ করিয়া একবার একবার দ্বার খুলিয়াছেন, তাহা আর বন্ধ করেন নাই।

বেহুলা কাঁদিতেছিলেন–

"অমৃত সমান প্রভুরে তোমার মুখের বাণী,
পুনরপি না শুনিলাম মুই অভাগিনী।
হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিব কঙ্কণ করিব চুর,
মুছিয়া ফেলিব আমি সিঁথির সিন্দুর।
এ হেন সুন্দর রূপ প্রভুরে প্রকাশিত রজনী,
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া রূপ প্রভু হরিল নাগিনী।
চাঁপার কলিকা সম প্রভুরে তোমার কোমল অঙ্গুলি,
তুমি আমার প্রভুরে
অভাগী বেহুলারে ডাক, চাহ চক্ষু মেলি।"

সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামীর শব ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, আলুলায়িতকুন্ডলে সিন্দুর-রঞ্জিত কপালে দেবীর ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছেন; তিনি যে অস্ফুটস্বরে রোদন করিতেছিলেন, তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করাতে সে রোদন থামিয়া গিয়াছে, কেবল সাক্ষীস্বরূপ একটি উজ্জ্বল অশ্রু গণ্ডের অর্দ্ধপথে লগ্ন হইয়াছে। সনকার সঙ্গিনীগণ বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল। "খণ্ড-কপালিনী বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামীর জীবন নাশ করিলি। তোর সিঁথির প্রথম সিন্দুরবিন্দু ঘোঁচে নাই, পট্টবস্ত্র মলিন হয় নাই, পদের আলতায় এখনও ধূলি পড়ে নাই, বাল - রাত্রেই বংশের দীপ নিবাইলি।"

"খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরুণী দাঁতী
বিহাদিনে খালি পতি না পোহাইতে রাতি।"

সনকা পুত্রের বিবর্ণ বিষজর্জ্জরিত মুখমণ্ডল দেখিয়া উম্মিলিত তরুর ন্যায় সেই স্থানে নিপতিত হইলেন। চাঁদ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

বেহুলা রমণীগুণের নিন্দা শোনেন নাই, তাঁহার মন সেদিকে ছিল না, জন্মের তরে স্বামী একটিবার তাহার অঙ্গস্পর্শ চাহিয়াছিলেন, জন্মের তরে একটিবার তাহার হাতের রাঁধা ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন, বেহুলা তাহাও দিতে পারেন নাই, সেই কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। রমণীগণ সত্যই বলিয়াছে, সে ত খণ্ডকপালিনী ও চিরুন্দাতী, অহা না হইলে এরূপ পোড়া-অদৃষ্ট কাহার হয়, বিবাহের রাত্রে স্বামীর মৃত্যু কাহার হইয়া থাকে! বেহুলার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে উদ্যত হইল, তিনি তাহা নিরোধ করিলেন।

একবার মাত্র চক্ষু তুলিয়া বেহুলা দেখিলেন, প্রৌঢ়া স্নেহ-বিহ্বলা মুবিচ্ছতা সনকা দিবচ্যুতা কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছেন, এমন শাশুড়ীকে লইয়া তিনি আয়তি চিহ্ন ধারণ করিয়া একদিনও সংসার করিতে পারিলেন না!

"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।
জ্ঞাতিগণ ধ'রে নিল গাঙ্গুড়ের কুল।"

বেহুলার আজ কোন লজ্জা নাই, তিনি স্বামীর শবের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লখার জন্য পদ্ম-গন্ধি কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত হইল–বেহুলা সেই চিতার পার্শ্বে যাইয়া বলিলেন, "যদি ইহাকে পোড়াইবে, তবে আমি ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে চিতায় প্রবেশ করিব। কিন্তু ইঁহাকে পোড়াইয়া কাজ নাই, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পোড়াইবার নিয়ম নাই, ইঁহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও, কি জানি যদি কোন রোঝার কৃপায় ইনি প্রাণ পান আর সেই ভেলায় আমি ইঁহার সঙ্গে যাব।"